Information about Widows of Tiger Victims in the Sundarbans Impact Zone

Context: Shyamnagar,Satkhira.

সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় বাঘের আক্রমনের ফলে সৃষ্ট বিধবা মহিলাদের কিছু তথ্য

প্রেক্ষিতঃ শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

লিডার্স

LEDARS

প্রধান কার্যালয়

গ্রামঃ মুন্সীগঞ্জ, ডাকঘরঃ কদমতলা,

উপজেলাঃ শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা-৯৪৫৫

ফোনঃ +৮৮ ০১৭২০৩০৩৩৮, ০১৭১৭ ২৮৭৯০২

ই-মেইলঃ mohongus@yahoo.com, ledars_bd@yahoo.com

আমাদের কিছু কথা

সুন্দরবনের সম্পদ কেন্দ্রিক গড়ে উঠা মনুষ্য বসতির প্রধান পেশা সুন্দরবন থেকে সম্পদ আহরন। জীবন ধারনের জন্য প্রথমে বেছে নিয়েছে এ পেশা। পরবর্তীতে চিংড়ি চাষ ও কৃষি ভুমি ধ্বংস তাদেরকে পুরোপুরি সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে । হিংস্র রয়েল-বেঙ্গল টাইগার, কুমির, সাপ ও অন্যান্য জীবজন্তুর ভয়ঙ্কর থাবাকে উপেক্ষা করে সন্তানের মুখে আহার তুলে দেওয়ার জন্য নেমে পড়েছে লোনা জলে। এ অসহায়ত্বের সুযোগে অনেক মানুষকে বাঘের আক্রমনের স্বীকার হতে হয়েছে।

'স্বামীঘাতিনী' বলে শশুর বাড়ী ও বাপের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে সরকারী খাস জায়গায়। হতদরিদ্র ও অসহায় বলে তারা তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে যায়। আমাদের সমস্ত অনুসন্ধিৎসু নজরের আড়ালে থেকে গেছে তারা। অদ্যবধি সরকারী-বেসরকারী প্রকল্প থেকে তারা কোন সুযোগ পায়নি। স্থানীয় বেসরকারী সংগঠন হিসেবে আমাদের তাদের সাথে কাজের খাতিরে পরিচয় হয়। অত্যন্ত আবেগ দিয়ে এ সকল অসহায় বিধবাদের দুঃখ বুঝেছি বলে তাদের মানবিক কল্যান সাধনে কিছু করতে চাই।

দারিদ্রতা নিরসন তাদের প্রধান প্রত্যাশা। কিন্তু নিঃস্ব হওয়ায় তাদের উন্নয়ন করাও কিছুটা কঠিন। আমরা চেষ্ঠা করছি সরকারী সম্পত্তিতে উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নতুন কৌশলে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। সমাজে তারা অবাঞ্চিত ও বঞ্চিত বলে তাদের মানবিক উৎকর্ষ সাধন জরুরী। মানসিক শক্তি জুগিয়ে তাদেরকে বুঝতে সুযোগ করে দেওয়া যে তারাও মানুষ ও তাদের স্বামীর মৃত্যুর সাথে তার 'হতভাগ্যতা' দায়ী নয়। তাদের কে সংগঠিত করছি। ওয়ার্ড়, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ে সচেতন ও ক্ষমতায়ন করার উদ্যোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সুবিধা প্রদানকারী সেবা সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করারও চেষ্টা করছি।বাঘের আক্রমনের স্বীকার এমন পঙ্গু লোকদের পুনর্বাসন করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমাদের সকল প্রচেষ্ঠা একটা স্বপ্ন বলে মনে হয়েছে। এ স্বপ্ন স্বার্থক করতে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছি এবং অনেক স্থান থেকে তাদের ইতিবাচক সাড়াও পেয়েছি। আমাদের সকল উদ্যোগ, পরিশ্রম যদি অসহায় কিছু বিধবাদের কল্যান করতে সক্ষম হয়, তবে আমাদের পরিশ্রম ও স্বপ্ন স্বার্থক হবে বলে আমরা মনে করি।

মোহন কুমার মন্ডল
নির্বাহী পরিচালক
লিডার্স

সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় বাঘের আক্রমনের ফলে সৃষ্ট বিধবা মহিলাদের সমস্যা

ভুমিকা

সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় বসতি শুরু হয় সুন্দরবনের সম্পদরাজীর উপর ভিত্তি করে। সুন্দরবন প্রভাবিত উপজেলা গুলোর মধ্যে শ্যামনগর একটি উলেখযোগ্য জনপদ। এ উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের বেশীরভাগ জনগন সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এ ইউনিয়ন গুলোর মধ্যে গাবুরা ইউনিয়ন সবচেয়ে বেশী সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগন বসবাস করে। উলেখিত গাবুরা ইউনিয়ন অত্যন্ত দরিদ্র পীড়িত ইউনিয়ন। এখানের ৭০% পরিবার সুন্দরবন নির্ভরশীল। পেশায় এরা সুন্দরবনের জেলে বাওয়ালী, মৌয়ালী, পোনা সংগ্রহকারী। এ সকল পরিবারের আয়ক্ষম সদস্যরা যারা সুন্দরবনে যান তারা অনেকেই বাঘের ও কুমিরের আক্রমনের শিকার হন এবং মৃত্যু বরণ করেন। গণ উন্নয়ন সংস্থা ও গাবুরা ইউনিয়ন পরিষদের এক জরিপে জুন ১৯৯৯ সাল থেকে জুন ২০০৬ তারিখ পর্যন্ত শুধু মাত্র গাবুরা ইউনিয়নে ২৮৮ জনকে বাঘে ধরেছে যার মধ্যে ৩৮ জন পঙ্গু অবস্থায় বেচে আছে এবং বাকীরা সব মারা গেছে। সমগ্র সুন্দর বন প্রভাবিত এলাকায় এ ধরনের হাজার হাজার পরিবার রয়েছে।

১৯৯৯ সাল থেকে জুলাই ২০০৬ পর্যন্ত ওয়ার্ড ওয়ারী বাঘের আক্রমনের সংখ্যা

ওয়ার্ড নং	গ্রাম	মোট বাঘের আক্রমনের শিকার	নিহতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	লিঙ্গ	
					পুরুষ	মহিলা
০১	খোল পেটুয়া	১৪	৯	৫	১৪	০
০২	গাবুরা	১১	৯	২	১১	০
০৩	লেবুবুনিয়া	৭	৭	০	৭	০
০৪	খলিসাবুনিয়া	৯	৯	০	৯	০
০৫	পাশ্বেমারী	৩৫	২৬	৯	৩৫	০
০৬	চাঁদনীমুখা	৫৯	৫৩	৬	৫৯	০
০৭	ডুমুরিয়া	৫৩	৪৬	৭	৫৩	০
০৮	চকবারা-খলিসাবুনিয়া	৫২	৪৯	৩	৫২	০
০৯	সোরা	৪৮	৪২	৬	৪৮	০
	মোট	২৮৮	২৫০	৩৮	২৮৮	০

শ্যামনগরের মোট ১২ টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭টি ইউনিয়নের জনগন সরাসরি সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। গাবুরা তাদের মধ্যে অন্যতম। এ রকম চিত্র ঐ ৭ টি ইউনিয়নেও পাওয়া যাবে।

বিধবা মহিলাদের সমস্যা নিরূপনের জন্য আমাদের সংগঠন বিভিন্ন বিধবা মহিলাদের সাথে একাধিক মিটিং, এফ জি ডি'র আয়োজন করেছিলো। বিভিন্ন মিটিং ও এফ জি ডি থেকে নিন্ম বর্নিত সমস্যা গুলো চিহ্নিত হয়েছে।

সামাজিক কুসংস্কারঃ এলাকার মানুষের বদ্ধমূল ধারনা যে, অলক্ষী মহিলার জন্য তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এ ধারনা থেকেই একজন মানুষ বাঘের আক্রমনের শিকার হওয়ার পর পরিবার থেকে ঐ বিধবার উপর শুরু হয় মানসিক ও শাররিক নির্যাতন। অনেক বিধবা আছে যারা স্বামী মারা যাওয়ার পর বাবার বাড়িতে এবং বেশী অংশ নদীর চরে সরকারী খাস জায়গায় ও অন্যের জমিতে বসবাস করছে। গাবুরা ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের শশুরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র বাসবাস কারী বিধবাদের সংখ্যা

ক্র নং	অবস্থানের ধরন	মোট সংখ্যা (টি পরিবার)
০১	অন্যত্র বসবাস করে	৫

০২	বাবর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে	২১
০৩	খাস জায়গায় বসবাস করে	৩০
০৪	অন্যের জমিতে বসবাস করে	১০

ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিতঃ অধিকাংশ পরিবার গুলো খাস জায়গায় বসবাস করায় তারা হত-দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত। স্থায়ী বাসস্থান না থাকার কারণে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংগঠনের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হন।

তাদের সন্তানরা স্কুরে যেতে পারে নাঃ স্বামী মারা যাওয়ার পর তাদের একমাত্র পেশা সুন্দরবনে চিংড়ি পোনা ধরা নিষিদ্ধ হলেও তারা জীবনের তাগিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্তান সহ সুন্দরবনে গমন করে। তাদের জীবন যাত্রা যেহেতু জোয়ার-ভাটা কেন্দ্রীক এবং তাদের সন্তানরা তাদের সাথে পোনা ধরতে যায় বলে তাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে পারেনা।

রোগ বালাই বৃদ্ধিঃ দীর্ঘক্ষণ লোনা পানিতে থাকার ফলে চর্মরোগ সহ মহিলা ঘটিত নানা রোগে আক্রান্ত হলেও অর্থাভাবে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহন করতে পারে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ কেন্দ্রে বিনামূল্যে রোগী দেখা ও দরিদ্র রোগীদের ঔষধ প্রদান করার বিধান রয়েছে। কিন্তু ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র যথাযত ভাবে দায়িত্ব পালন না করায় তারা নূন্যতম চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত।

পারিবারিক নির্যাতনঃ সাধারণতঃ দরিদ্র পরিবারের সাথে দরিদ্র পরিবারের আত্মীয়তা হয়। যখন একজন বিধবা তার বাবার বাড়ীতে অথবা ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেয় তখন সে (বিধবা) ঐ পরিবারের বোঝা হয়ে যায়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অথবা বাহিরের কারো দ্বারা যদি উক্ত বিধবা অত্যাচারিত হন তাহলেও তার পক্ষে তাদের পরিবারের কোন ব্যক্তি প্রতিবাদ করেন না; কারণ তারাও চায় যে অত্যাচারিত হয়ে যদি সে এখান থেকে চলে যায় তাহলে আর্থিক ভাবে উপকৃত হবেন।

যৌন নিপীড়নঃ যখন একজন অল্পবয়স্ক মহিলা বিধবা হন তখন সে নানান সামাজিক প্রতিকুলতার শিকার হন। এলাকার বখাটে যুবক ও অসৎ ব্যাক্তিদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন এবং শেষ পর্যন্ত উপার্জনের জন্য পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন।

বিদ্যমান ঝুঁকি সমূহঃ

- সুন্দরবনের তীরবর্তী জনগোষ্ঠর মধ্যে উলিখিত গোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। বিধবা হওয়ার পর সামাজিক কুসংস্কার, পরিবারের অবহেলা, নির্যাতন প্রভৃতির কারনে বাবারবাড়ী, সরকারী খাস জায়গায়, নদীর চরে বসবাস করা এ সকল বিধবারা অর্থনৈতিক ভাবে খুব দূর্বল এবং তাদের পরিবার তাদের নিজেদের বহন করতে হয় বলে পরিবারের সদস্যরা মানবেতর জীবন যাপন করে। তারা পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করতে পারে না বিধায় চরম দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে।
- এলাকায় মহিলাদের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ কম বলে পরিবারের শিশু সহ অন্যান্যদের আয়মুলক কাজে যুক্ত থাকতে হয় বলে ঐ সকল পরিবারের সদস্যরা লেখা পড়া শেখার সুযোগ কম পায় এবং বংশ পরম্পরায় শ্রমিক হিসেবে গড়ে উঠে।
- উলেখিত পরিবারের সদস্যদের নূন্যতম স্বাস্থ্যসেবা ও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা গ্রহন নিশ্চত করতে না পারলে আগামী দিনেও তারা পরিবারের ও সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে।
- কুসংস্কারের কারনে বাঘে ধরা বিধবা মহিলাদের অলক্ষী ও অবহেলার চোখে দেখা হয় এবং সমাজে তাদের গ্রহন যোগ্যতা কম এবং এলাকার জনগন তাদের এড়িয়ে চলেন; সেকারনে তারা বিদ্যমান সরকারী ও বেসরকারী সুযোগ সবিধা থেকে বঞ্চিত।

সেবা প্রদানকারী সংস্থায় তাদের অভিগম্যতা

- আমাদের সমাজে প্রচুর সম্পদ রয়েছে যা অনেকক্ষেত্রে সঠিকভাবে ভাবে ব্যবহার হয়না। একদিকে এই সম্পদের সটিক ব্যবহার ও অন্যদিকে এরকম একটি মানবিক ইস্যুতে জনগনের সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগানো গুরত্বপূর্ণ। তাই উলেখিত পরিবারের সদস্যদের নূন্যতম স্বাস্থ্যসেবা ও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা গ্রহন নিশ্চত করার জন্য স্থানীয় সম্পদের সমাবেশের মাধ্যমে স্থানীয় জনগনের ব্যবস্থাপনায় একটি ব্যতিক্রমী কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন যাতে করে সমাজের/জনগনের সামনে একটি অনুকরনীয় উদহারণ হয়।

- সেবা প্রদান কারী সংস্থার মধ্যে তৃনমূল পর্যায়ে সেবা প্রদান করে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ এ বিষয়ে সচেতন নয় বলে সহযোগীতা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করে না এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তারা তাদের পছন্দের লোকদের মনোনীত করেন বলে এ বিধবারা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

- সমাজে বিদ্যমান বিধবা যারা অন্যান্য করনে বিধবা হয়েছে তারা শশুর পরিবারে থাকতে পারে, কিন্তু বাঘে ধরার কারনে বিধবা হলে তারা আর শশুর বাড়ীতে থাকতে পারেন না বলে তারা বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। তাদের কথা তুলে ধরার জন্য আজ পার্যন্ত তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে সেবা প্রদানকারী সংস্থা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের বেশী গুরুত্ব দেয়না।
- সেবা প্রদান কারী সংস্থা যেমন ইউনিয়ন পরিষদের বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, ভি জি ডি কার্ড, ভি জি এফ কার্ড বনবিভাগ-বনবীমা, সমাজ সেবা অধিদপ্তর পলী- মাতৃকেন্দ্র, মৎস্য অধিদপ্তর- খাস খালে লীজ প্রদান, প্রভূতি দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। যে সুযোগ পেলে একজন দরিদ্র পরিবার নূন্যতম সেবা পেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

গত ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে গাবুরা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সেবা প্রদানের বিবরণ নিরুপ

ক্র নং	সেবার ধরন	মোট সংখ্যা	লক্ষিত বিধবাদের সংখ্যা	(%) শতকরা হার
০১	ভি জি ডি কার্ড	২১০০	১৫	০.৭১
০২	ভি জি এফ কার্ড	১৯৫০	৯	০.৪৬
০৩	বয়স্ক ভাতা	১৬৭	৯	৫.৩৮
০৪	বিধবা ভাতা	৯১	৭	৭.৬৯

তাদের নেই আইনগত অধিকার

- গণ উন্নয়ন সংস্থা ও গাবুরা ইউনিয়ন পরিষদের এক জরিপে জুন ১৯৯৯ সাল থেকে জুন ২০০৪ তারিখ পর্যন্ত শুধু মাত্র গাবুরা ইউনিয়নে ২৭৯ জনকে বাঘে ধরেছে যার মধ্যে ৩৭ জন পঙ্গু অবস্থায় বেচে আছে এবং বাকীরা সব মারা গেছে। সমগ্র সুন্দর বন প্রভাবিত এলাকায় এ ধরনের হাজার হাজার পরিবার রয়েছে। এ পর্যন্ত তাদের ইস্যুটি উচ্চমহলে তুলে ধরা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজিক ভাবে ক্ষমতায়নের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

- গণ উন্নয়ন সংস্থা বিষয়টি জাতীয় ভাবে আলোকিত করা ও নীতি নির্ধারনী মহলের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য ৪টি জাতীয় ও ৩ টি আঞ্চলিক পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। (যা প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করা হল)
- সুন্দরবন এ এলাকার একটি বড় সম্পদ এবং বিশ্ব ঐতিহ্য। সরকার এখান থেকে প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আদায় করে থাকে। কিন্তু যারা রাজস্ব প্রদান করে তাদের জীবন হানী ঘটলে সরকারের কোন ক্ষতি পূরনের ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি সময়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় থেকে বন্য প্রানী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন ও সম্পদের ক্ষতি পূরণ প্রদানের বিষয়ে যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় জানতে চাওয়া হয়যে কি পদ্ধতি অনুসরন করলে বন্যপ্রাণী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন ও সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সম্ভব হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হাতির দ্বারা ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়টি প্রধান্য দেওয়া হয় এবং বাঘে বা কুমিরের বিষয়টিকে আমলেও আনা হয়নি। সংশিষ্ট মন্ত্রনালয়ে ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিষয় টি তুলে ধরতে পারলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঝঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য ক্ষতি পূরণের নীতিমালা প্রনয়ন করা সম্ভব হবে।
- এ ধরনের বাঘে ধরা বিধবাদের সংগঠিত করন এবং সেবা প্রদান কারী প্রতিষ্ঠানকে সংবেদনশীল করন এবং স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করনের মধ্যে দিয়ে এ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উন্নয়ন ও তাদের ক্ষমতায়ন করা যেতে পারে যা হবে সমগ্র সন্দরবন এলাকার অনুকরণীয় মডেল।

গাবুরা ইউনিয়নে বাঘের আক্রমনের ফলে পঙ্গু হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের নামের তালিকা

ক্র. নং	নাম	ঠিকানা	ওর্য়াড নং	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পঙ্গু ব্যক্তির ক্ষত স্থানের বিবরণ
১.	মোঃকামরুল ইসলাম	খোলপেটুয়া	১	৪জন	মাথা,পিট,সিনায় চলতে পারে
২.	আঃ রহিম খান	,,	১	৭জন	চোয়ালে ও বামহাত চলতে পারে
৩.	মোঃআতিয়ার শেখ	,,	১	৫জন	পিঠে ও ডান পায়ের উরুতে
৪.	মোঃআনছার গাজী	,,	১	৫জন	বাম পায়ের উরুতে
৫.	গোলাম মোড়ল	,,	১	১০জন	চোয়াল ও বামহাতএবংমাথায়
৬.	গোলাম মোড়ল	গাবুরা	২	১৪জন	মাথা মুখমন্ডল বাহু পিঠ
৭.	দ্বীন আলী	,,	২	৫জন	মাথা মুখমন্ডল পিঠ
৮.	ছুরাত খাঁ	পার্শ্বেমারী	৫	৫জন	পায়ের উরুতে পিঠে পাছায়
৯.	করিম গাজী	,,	৫	৬জন	পিঠের ডান পাশে
১০.	সাত্তার গাজী	,,	৫	৮জন	ডান পায়ের উরু ও পিঠে
১১.	মুনছুর মোড়ল	নাপিত খালী	৫	৫জন	গলা ও ডান কাঁধ
১২.	নূর মোহাম্মদ গাজী	,,	৫	৫জন	মাথা ও পিঠে
১৩.	জনাব আলী হাওলাদার	,,	৫	৯জন	ডান হাতও পিঠের ডান পাশ ও ডান উরু
১৪.	হাতেম হাওলাদার	,,	৫	৬জন	দু পা ও পাছা
১৫.	মুনছুর মোল্যা	,,	৫	৮জন	কপাল ও মাথা
১৬.	মাওলা গাজী	,,	৫	৪জন	পঙ্গু
১৭.	নূরমান গাজী	১০নং সোরা	৬	৩জন	মাথায় গাড়ে ও শরীরের
১৮.	আরশাদ শেখ	,,	৬	৬	ঘাড়ে ও মুখে
১৯.	আমিনদ্দীন গাজী	,,	৬	৪	হাতে ও শরীরে
২০.	জিয়ারুল ইসলাম	,,	৬	৯জন	হাতে ও শরীরে
২১.	মোঃআমজাদ	১০ নং সোরা	৬	৭	শরীরের একাধিক স্থানে
২২.	আহম্মাদ	,,	৬	৭	৭কোমরে ও ঘাড়ে আঘাত
২৩.	কাশেম মোড়ল	ডুমুরিয়া	৭	৬	হাতে পিঠে মাথায় চোখে
২৪.	ফোরকান মালি	,,		৭	
২৫.	আঃ কাশেম মোড়ল	ডুমুরিয়া	৭	৬জন	হাতে মাথায় পিঠে ও চোখে
২৬.	আজিজ সরদার	,,	৮	১২জন	পেটে বাম পাশে ও মাথায়
২৭.	রেজাউল গাজী	,,	৮	৫জন	মাথায় চোয়াল ওঘাড়
২৮.	কাশেম মিস্ত্রী	,,	৭	৪জন	বাম কপাল পেটে
২৯.	ফেরদাউস মোড়ল	,,		৮জন	ডান হাত ও পাছা
৩০.	তোফাজ্জেল তরফদার	,,		৭জন	ডান পা
৩১.	আহম্মদ তরফদার	চকবারা	৮	৮জন	বুকে ডান পাশে ও বুকে
৩২.	নূরমোহাম্মাদ কয়াল	,,		৮জন	মাথায় বুকে হাতে
৩৩.	মুরশিদ	,,		৮জন	চোয়াল বাহু পিঠে
৩৪.	এনছান খাঁন	৯নং সোরা	৯	৬জন	
৩৫.	ছরাপ খাঁন	,,		৭জন	
৩৬.	রহিমা খাতুন	,,		২জন	
৩৭.	ফেরদাউস	,,		৭জন	
৩৮.	গোলাম সরদার	,,		৭জন	

বাঘের থাবায় জীবন ফিরে পাওয়া হাসমত আলীর কথা

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার আটুলিয়া ইউনিয়নের পূর্ব বিড়ালক্ষ্মী গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্টির অধিকাংশ জীবিকা নির্বাহ করে সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে। পূর্ব বিড়ালক্ষ্মী গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খোলপেটুয়া নদী। এ নদী ও সুন্দরবনের সাথে তাদের জীবন গাঁথা ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না। পূর্ব পুরুষ থেকে সুন্দরবনের সাথে ওতোপ্রত ভাবে জড়িত এলাকার মানুষ। এমনি একটি সুন্দরবন নির্ভর পরিবারের সন্তান হাসমত আলী সরদার (২৪) পিতা মুনসুর আলী সরদার। হাসমত আলী ছোট বেলা থেকে দুর্দান্ত সাহসী প্রকৃতির। মুনসুর আলী সরদারের ৭ ছেলে ও ২ মেয়ে। তার মধ্য হাসমত আলী সরদার চতুর্থ। পরিবারের অভাবের কারণে তার পড়াশুনা করা হয়ে উঠেনি। কোন প্রকার দিন আনা-দিন খাওয়া এই পরিবার খাস জমিতে বসবাস করতো। পিতা মুনসুর আলী সরদার হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ১০ কাঠা জমি কিনলেন। সুখের স্বপ্ন দেখতেন তাদের সন্তানদের নিয়ে, একটা নৌকাও তৈরী করলেন। পরিবারকে সুখে রাখার স্বপ্নে নৌকা নিয়ে প্রথম বনে গেল পোনা ধরার উদ্দেশ্যে চাচাতো ভাই তোফাজ্জেল ও ইনসার হোসেনের সাথে হাসমত আলী বনে যান। ১৯৯৫ সালের অক্টোবার মাসের ১০ তারিখে কৈখালী ফরেষ্ট অফিস থেকে এক ভাটির পথ। এক সপ্তাহের পাস নিয়ে কাছিটানা নদীতে মাছ ধরতে যায়। পঞ্চম দিনে ভোর ৪ টার পোনা সংগ্রহের কোন এক সুযোগে ওৎ পেতে বসে থাকা বাঘ ঝাপিয়ে পড়ে হাসমত আলীর উপর। সাথীরা সবাই তখন যে যার মত পোনা সংগ্রহে ব্যস্ত। হাসমতের চিৎকারে সবাই সজাগ হয়ে খোঁজা শুরু করে। কিন্তু ততক্ষনে হাসমত রয়েল বেঙ্গলের কোলে বন্দী। এই দৃশ্যে পাশের অন্য সব সাথীরা আত্ম গোপনের চেষ্টা করলেও চাচাতো ভাই তোফাজ্জেল শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে ভাইয়ের জন্য চেষ্টা করেছ। হাতের কুঠার ও বৈঠা দিয়ে বাঘের সাথে লড়াই করে ভাইকে ফিরিয়ে আনে। সারা শরীরে বাঘের থাবায় জরাজীর্ন। মুখের বাম পাশ চুর্ন বিচর্ন শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। হাসমত কে নৌকায় করে ভেটখালী বাজারে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। তখন হাসমত মৃত প্রায়, কান্নায় সাথীরা ভেঙ্গে পড়ল। তারপর ভেটখালীতে চিকিৎসার কোন উপায় না পেয়ে শ্যামনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্যামনগর হাসপাতালের ডাক্তার দেখে তার গায়ে হাত দিতে সাহস পেলনা। তখন ও জীবিত আছে হাসমত। সাথে সাথে ডাক্তারদের পরামর্শে খুলনা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যেয়ে সেখানে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। বিনা মেঘে বজ্রঘাতের মত চরম দূর্ভোগ নেমে আসে তার পরিবারে। ভাইদেও সহযোগিতায় ১৫,০০০/= টাকা যোগাড় করে নিয়ে যাওয়া হয় তার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। ১৫ দিন চিকিৎসার পর ১৬ দিনে জ্ঞান ফিরে আসে। সবাই কে দেখতে থাকে এক চোখে। ডাক্তার কিছু সম্ভাবনা দিলেন। অপর দিকে পারিবারে তার মা কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন। তার বন্ধুরা সকলে মিলে চাঁদা কালেকশন করা শুরু করল। হাসমত আলীর পিতা মাতা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে নেমে পড়ল। এভাবে নিরাশ্রয় জীবনে শেষ সম্বল গরু, হাঁস-মুরগী, বসত ভিটার কিছু অংশ বিক্রি করে এবং গ্রাম বাসীর সহযোগীতায় হাসমত দীর্ঘ ২ মাস চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থতা ফিরে পায়। তার মুখের বিকৃতি ঘটেছে, বামপাশে উপরের দাঁতের পাটিতে ৮টি দাঁত নেই। মুখের আকৃতি এমন বিভৎস যে সাধারণ মানুষ দেখলে ভয় পায়। মুখে সর্বক্ষন রুমাল দিয়ে বেঁধে রাখে। মানুষের সাথে কথা বলতে গেলে শুধু কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে; আর বলে আমার এ মুখ দেখাতে পারবনা। বাচ্চারা দেখলে ভয় পায়। অন্য দিকে পিতা মুনসুর আলী বানের মুখে খড় কুটুর মত ভেসে যাওয়া সংসার টাকে জীবন দিয়ে আগলে রেখেছে। দরিদ্র বাবা মা আজও পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটু সাহায্য সহানুভুতির জন্য, কিন্তু অভাব যেখানে নির্মম করুনা, সেখানে দূর্লভ; সাহার্য দুঃপ্রাপ্য; দেখতে দেখতে ২ বছর কেটে গেল হাসমত আলী অনেকটা সুস্থ। দরিদ্র পিতামাতা পারিবারিক গন্নি, সামাজিক নিন্দা হজম করে তার বিয়ের কথা ভাবেন। ২০০০ সালের জানুযায়ী মাসে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে তার ২টি সন্তান একটি ছেলে আবুল হোসেন ও ১টি মেয়ে সালমা, তার স্ত্রী শাকিলা জানান প্রথমে স্বামীর মুখ দেখলে ভয় করত। কিন্তু সব কিছু কপালের পাওয়া। হাসমত আলীর প্রত্যাশা কোন সহযোগিতা পেলে সে চিকিৎসা হয়ে স্বাভাবিক মানুষের মুখ মন্ডলের আকৃতি ফিরে পাবে।

চোখের জলে একাকার বুলিদাসীর সংসার

অপরূপ লীলাভূমির এই পৃথিবীর বুকে দু-বেলা দুমুঠো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার প্রত্যাশা গ্রামবাংলার প্রতিটি শ্রম জীবি মানুষের। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলার সর্ব দক্ষিনের শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের জেলে পাড়ার আর দশ জন জেলের মত অরুণ জেলের জীবন ও কাটছিলো গতানুগতিক ধারায়। স্ত্রী-পুত্র,কন্যা ও নিজের বেচে থাকার জন্য সেও রোজগার করত, পাড়ার জেলেদের সাথে বনে যেত মাছ ধরতে। মাছ বেচে উপার্জিত অর্থ সাংসরিক কাজের পাশাপাশি সে কিছুটা সঞ্চয় ও করত। এভাবে দিনাতিপাত করছিল অরুণ কুমার। জেলে পাড়ার মধ্যে তার সংসারে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসে এবং সঞ্চয়কৃত টাকা দিয়ে পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘর তৈরীর বাসনা ছিল অরুণ জেলের। মনে অনেক আশা নিয়ে সে সুখের স্বপ্ন দেখছিল। আশা পুরণের জন্য ঘরের চাল তুলেছিল। কিন্তু বিধি বাম। সঙ্গীদের সাথে মাছ ধরতে গিয়ে বনে মর্মান্তিক ঘটনার

শিকার হল অরুণ জেলে। অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটল গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০৪ তারিখ-রোজ সোমবার ভোর ৫ টা ৩০ মিনিটে। আঠার বেকী নদীতে মাছ ধরছিল অরুণসহ অন্যান্য জেলেরা হঠাৎ সঙ্গী নেপাল জেলে নদীর পাড়ে ঝোপের আড়ালে শিকারী বাঘকে ওৎ পেতে বসে থাকতে দেখে সকলকে সাবধান হতে বলে। কিন্তু সাবধান হওয়ার পূর্বেই আকস্মিকভাবে ঝাপিয়ে পড়ে বাঘ অরুণের উপর। অরুনকে নিয়ে বাঘ বনের মধ্যে চলে যায়। সকলের চিৎকারে এক নিদারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, জীবনের করুন পরিনতি ঘটে অরুণের। বাঘের আক্রমণে অরুণের নিদারুণ মৃত্যুর পর শোকে মৃহ্যমান হয়ে পড়ে তার সহধর্মিনী বুলিদাসী। সাত বছরের বড় ছেলে রুবেল, পাঁচ বছরের মেয়ে রুপালী ও দুই বছরের মেয়ে শেফালীকে নিয়ে মহাবিপাকে পড়ে বুলিদাসী। সংসারের একমাত্র রোজগারের ব্যক্তি স্বামীর মৃত্যুতে অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে বুলিদাসী। প্রথম প্রথম পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনেরা কিছুটা সহানুভূতির হাত বাড়ায় । পিত্রালয়ে ভাইদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বুলিদাসী। কিন্তু খুব বেশি দিন আর সুখ সইল না তার কপালে। ভাইয়েরা তাড়িয়ে দিল তাকে পিত্রালয় থেকে। অগত্যা উপায়ন্ত না দেখে পথে নামল বুলিদাসী। ছেলে মেয়েদের অন্ন জোগাড়ের জন্য ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিল বুলিদাসী। মুন্সীগঞ্জ বাজারের দোকানে দোকানে ভিক্ষা করে সে। মায়ের পিছু পিছু আচল ধরে থাকে অবোধ বাচ্চারা। প্রথম দুএক টাকা করে ভিক্ষা দিত সব দোকানদারা। কিন্তু বর্তমানে কেউ আর ভিক্ষা দিতে চায় না বুলিদাসীকে। দু-এক জনে দু-এক টাকা দেয় আর বাকীরা দেয় তিরষ্কার,গালি,লাঞ্ছনা। বুকভরা বেদনা নিয়ে তবুও বুলিদাসী সন্তানদের বাচানোর জন্য তাদের মুখে আহার জোগানোর জন্য মুন্সীগঞ্জ বাজারের পাশে থেকে ভিক্ষা করছে। অনিশ্চয়তাই তার ভবিষ্যৎ তবুও-বুলিদাসীর প্রত্যাশা।

১। বাঘের ধরা পরিবারে সরকারী সহযোগীতা।
২। বন বিভাগের সাহায্য।
৩। বাঘে ধরা ব্যক্তিকে যথা সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।
৪। মৃত্যুর পরে পরিবারকে কোন আর্থিক সহযোগিতা করা।
৫। মহিলাদের আর্থিক সাহায্য।
৬। শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

রূপবান কন্যা

গাবুরা ইউনিয়নের ৯নং সোরা গ্রামের দরিদ্র মৌয়ালী ছিলেন আরশাদ কয়াল। তার স্ত্রী রূপবান বিবি (৪৫)। ভাটির দেশে সুন্দরী মেয়েদের নাম রাখে রূপবান। সেই রূপবান। সেই রূপবানের ১ মেয়ে ও ৩ ছেলে নিয়ে পরিবারটা ভালই ছিল। ১৯৭০ সালে আরশাদ আলীর বয়স তখন ৩৫ বছর। সুন্দরবনের আগুনজ্বালা নামক একটি জায়গায় মধু কাটার জন্য সবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিন্তু এরই মধ্যে বাঘের আক্রমনের শিক্ষার হন। তার সঙ্গীরা বাঘের সাথে যুদ্ধ করে ও তাকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারিনি। লাসটাকে নিয়ে রূপাবন বিবির সম্মুখে রাখে। কম বয়সী রূপবান বিবি (তখন বয়স ২২) ছোট ছোট ৪ টি ছেলে মেয়েকে নিয়ে ধাধায় পড়ে যায়। সব কিছু অন্ধকার দেখতে থাকে। কিভাবে এগুবে সামনের দিকে। ভিক্ষা করে। স্বামীর দাফন সম্পন্ন করে। সন্তানদেরকে বুকে আগলে রাখে। নদীতে হাঙর কুমীরকে উপেক্ষা কওে জাল টানে, মাছ ধরে, রাস্তায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। বাচ্চাদের কে বড় করে তোলে। কাউকে লেখাপড়া শেখাতে পারিনি। ঐ সময়টাতে অনেকে বিয়ে করতে চাইলে সন্তানদেও মুখের দিকে তাকিয়ে বিয়ে করতে পারেনি। লোকের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতে গিয়ে অনেক কু-প্রস্তাবের সম্মুখিন হয়েছে। কিন্তু ফিরে তাকায়নি। বর্তমান ৩ ছেলে নদীতে জাল টানে। মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে। এ পর্যন্ত কোন সরকারী অর্থ পায়নি। সব কিছু হারিয়ে বর্তমান ৩ ছেলেকে নিয়ে দিন-আনা দিন খাওয়ার ভিতর দিয়ে জীবনের সংঙ্গে সংগ্রাম করে চলছে রূপবান বিবি।

মোছাঃ নেছা খাতুন (৩৭)

স্বামী-মৃতঃ রুহুল কুদ্দুস মালী। গ্রাম-৯ নং সোরা, গাবুরা ইউনিয়ন।

১৯৯৪ সালের কথা। নেছা খাতুনের বয়স তখন ২৫ বছর। ১ ছেলে, ১ মেয়ে। স্বামী সোহাগে সোহাগীনি নেছা খাতুনের বুকটা কেপে উঠেছিল তার স্বামীর সুন্দরবন গমনের সময়। কিন্তু মুখে শুধু বলছিল, আলাহ্ তুমিই সহায়। স্বামী রুহুল কুদ্দুস মালী তার কাপালে সোহাগ চুম্বন একে বলেছিল বাচ্চাদের দেখ। সুন্দরবনের তেলকোয়া খালে গিয়েছিল মাছ ধরতে। আর ফিরে আসেনি, শুনতে পারিনি তার স্বামীর কথা। দেখতে পায়নি তার স্বামীর মুখটাও। যারা সাথে গিয়েছিল তারা এসে বলল, “আর পারলামনা তোমার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে বাঘের মুখ থেকে।” কেঁদেছিলো ভীষন। কিন্তু ভেঙে পড়েনি। শশুর-শাশুড়ীর অত্যাচারে ছেলে মেয়ের হাত ধরে চলে আসছিল বাপের বাড়ী। সেই থেকে আজও বাপের বাড়ীতে থাকে। বাচ্চাদের পড়াশুনা করায় লোকের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে। বিয়ের প্রস্তাব আসলেও বিয়ে করেনি। সরকারী সহযোগিতার প্রত্যাশায় সে এখনও দিন গুনছে।

ফরিদা খাতুন (২৮)

স্বামীঃ মৃত সাত্তার গাজী; গ্রামঃ ৯নং সোরা। গাবুরা ইউনিয়ন।

১৪০৭ সালে বৈশাখের ২৫ তারিখে সুন্দরবনের ইলশেমারী খালের কাছে সাত্তার গাজী মধু কাটতে গিয়েছিলো। সেখানে তাকে বাঘে ধরে। তার সাথের প্রতিবেশী দুই জন তার লাশটি ফরিদা খাতুনের ঘরে নিয়ে আসে। দুই ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে ফরিদা খাতুন তখন কিছু ভাবতে পারেনা। চোখে যেন শর্ষে ফুল দেখে। শুধু শান্তনা পায় সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে। সংসারে আয়ের কোন লোক নেই।কোন রকমে অন্যের ক্ষেতে দিনমুজুরি করে যা আয় হয় তাই দিয়ে সংসার চলে। মেয়েটার প্রায় বিয়ের বয়স হয়েছে। তাই নিয়ে ভাবনা। এখনো কোন সরকারী অর্থ সে পায়নি। সে কোন সাময়িক সহযোগিতা চায়না। তার দাবী এনজিওদের সহযোগিতা যাতে সে একটি টেকসই জীবিকা গ্রহন করতে পারে।

যজ্ঞের আগুনে জললো উষার সংসার

শ্যামনগর থানা মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ কদমতলা গ্রামে ধর্মীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ময়দানে পূন্যার্থীর জোয়ার তখন, সাধু পাড়ার পূন্যার্থীর হরিধ্বনিতে সাধু পাড়ার বাতাস মুখরিত , মহাযজ্ঞের কাঠ সংগ্রহের জন্য যারা সুন্দর বনে গিয়েছিল তাদের আর্ত্মনাদে বনের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সে নিয়েই এ ঘটনা প্রবাহ এমনি ঘটনার নির্মম শিকার ফনিভূষন ও ভাই হরিদাস। সদ্য বিবাহিত দু-ভাই যজ্ঞের জ্বালানী আনতে সদলবলে বনে গিয়েছিল। আর সবাই ফিরে এলেও ফনি ভুষন ও হরিদাসের আর ফেরা হয়নি বন থেকে। কাঠ সংগ্রহের কোন এক মুহুর্তে ওৎ পেতে থাকা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে হরিদাসের উপর। অন্য সবাই তখন যে যার মত কাঠ সংগ্রহে ব্যস্ত; হঠাৎ হরিদাসের চিৎকারে সবাই খোঁজা খুজি করতে থাকে। কিন্তু ততক্ষনে হরিদাস রয়েল বেঙ্গলের কোলে বন্দী। এ দৃশ্যে অন্য সবাই ভয়ে আত্ম গোপনের চেষ্টা করলেও রক্তের ভাই ফনিভুষন শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ভাইয়ের জন্য জীবন দিয়েছে। হাতের কুঠার দিয়ে বাঘের সাথে লড়াই করেছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। রয়েল বেঙ্গলের বিষাক্ত থাবায় দু ভাইয়ের যুগল মৃত্যু বনের বাতাসও সেদিন কেঁদেছিল; কাঁদিয়েছিল যজ্ঞের সহস্র পূন্যর্থীকে। তবে কান্নায় ক্ষমতা হারিয়েছিল দুই ভাই এর নববিবাহিতা দুই বউ উষা এবং বর্ষা।

সময়টা বাংলা ১৪০৮ সনের ২রা চৈত্র সকাল ১১টা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত উষা আর বর্ষার জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। বড় ভাই ফনি ভূষনের স্ত্রী উষা তখন এই হাবুডুবু সংসারের একমাত্র কর্নধার। শ্বশুর-শ্বাশুড়ি এবং বিবাহ যোগ্য দু বোন সংসারের দূভাগ্যময় বোঝা। সদ্য বিধবা ছোট বউ বর্ষা দিশা হারা হয়ে বাবার বাড়ি হরিনগরে আশ্রায় নিয়েছে। কিন্তু দরিদ্র পিতামাতা তার বিয়ের কোন ব্যবস্থা আজ ও করতে পারিনি। পারিবারিক গর্ঘনি সামাজিক নিন্দা হজম করে বেদনার পাথর বুকে চেপে রেখেছে বর্ষা। স্বামীকে হারিয়ে বর্ষা বিয়ে করতে রাজি হয়নি। বর্তমানে বর্ষা দিশে হারা, সংকিত তার ভবিষ্যত নিয়ে। অন্যদিকে উষা যেন নির্মম নিয়তির নিরব স্বাক্ষী। প্রবল বানের মুখে ভেসে থাকা খড় কুটুর মত সংসার টাকে জীবন দিয়ে আকড়ে রেখেছে। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটু সাহায্য সহনুর্ভূতির জন্য।

উষা দারস্থ হয় জন প্রতিনিধিদের কাছে, ১টি ভিজিএফ কার্ড জুটেছে তাদের দয়ায়। কিন্তু যে সংসারে কোন প্রতিনিধিই কর্মক্ষম নয় ১টি ভিজি এফ কার্ড তাদের কত জনকে অন্ন যোগাতে পারে? এহেন হত দরিদ্র পরিবারের সামনে কোন স্বপ্ন উকি দেয় না। কোন সরকারী কিংবা বেসরকারী সাহায্যের আশ্বাস আজ ও উকি দেয়নি উষা-বর্ষাদের দুয়ারে, যাদের জীবন ভরা আঁখিজল উষা-বর্ষা তো তাদের দলে। আজকের ভোগ অপচয়ের কালে উর্ষা-বর্ষারা যে দোজখের ঘানি টেনে চলেছে, এ জিম্মি দশা থেকে তাদের কি মুক্তি নেই?

জীবন সংগ্রামে সাহিদা বেগম

শ্যামনগর উপজেলায় সিঁথিতে সুন্দর বনের আঁচলে বেড়ে ওঠা মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়ন অবহেলার ছায়া দিয়ে ছাওয়া। তারই কোল ঘেষে কালিনগর গ্রাম,সেখানে আসমানীদের মত সংসার গড়ে তুলে ছিল সাহিদা বেগম আর স্বামী রহমান মোড়ল একমাত্র সন্তানকে নিয়ে। কিন্তু প্রকৃতির হাতে অসহায় মানুষের সব সাধ কি পূন্য হয়? সাহিদা বেগমের সে সাধও তীরে তরী ডোবার মত অপূর্ণ রয়ে গেল। সুন্দরবন তার আবাল্য মমতা দিয়ে জীব পালনের মত এলাকার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সেই সুন্দরবনের বাঘে গিলে খেয়েছে সাহিদার স্বপ্ন আর অবলম্বন। সাহিদা বেগম আজ আর কাঁদেনা। চোখের সব জল যেন শুষে নিয়েছে সুন্দরবন। যে সুন্দরবন সারা জীবন অহংকার সাহিদার কাছে তা আজ অভিশাপ। ১৯৯৯ সাল সাহিদা বেগমের জীবনে অভিশপ্ত ছিল। তাদের সংসার চলত বন থেকে মাছ ধরে। প্রতিদিনের মত রহমান জীবন আর জীবিকার জন্য যথারীতি ডিঙ্গি ভাসিয়ে ছিল বনের খালে। হিংস্র রয়েল বেঙ্গল এতটুকু কার্পন্য করেনি। হিংস্র থাবায় গিলে খেল রহমানের জীবন, সহিদার স্বপ্ন। গরীবের পর্ন কুঠিরে স্বামীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠা সাহিদার সংসার বালির বাধের মত ভেঙ্গে গেল, ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন গুলোও। চোখের জলের ঢেউ মিশে যায় নদীর জলে। তবু কান্নাকে অবলম্বন করে তো জীবন চলে না। তাই সন্তানকে বাঁচাতে সাহিদা বেগম মানুষের দারে দারে ভিক্ষার নোঙ্গর ফেলে কিন্তু জীবনকি এতই সোজা? মৃত্যু যেখানে বাসা বেধেছে তার নাম তো কারাগার সাহিদা বেগম সে কারাকাহিনীর জিম্মি নায়িকা। তাই তাকে জীবন যুদ্ধের ময়দানে লড়াইয়ে নামতে হয়। হাতে তুলে নিতে হয় চিংড়ী রেনু সংগ্রহের জাল। কোলের ছেলেকে পথের বুকে ফেলে চলতে থাকে সাহিদার সংগ্রাম। বুকে আদর যার ফুরোয় পথের ধুলো বোধ হয় তার সাথী হয়। সন্তানের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটাতে সাহিদা কে প্রাণন্ত পরিশ্রম করতে হয়। তবু অর্ধাহার অনাহার তার নিত্যসঙ্গী। কখনও রেনু সংগ্রহে কখনও দিন মুজুরী কখনও শ্রমিকের কাজ করে তার জীবন চলে। চার পাশের দুষ্ট লোকেরা সুযোগ পেলেই কু প্রস্তাব দেয় তাকে। কষ্টে আর ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়েছে অস্তি চর্ম সার শরীর। ক্লান্তিতে দুপায়ে অবসন্নতা তবুও বিরাম নেই এ লড়াইয়ের। তাই আগামী স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে সন্তানের মুখ চেয়ে ছুটে চলেছে অবিরাম। বাচচাটির জন্য পড়াশুনার কোনও সুযোগ করে দিতে পারেনি সাহিদা। অসসহায় সাহিদারা কখনও সরকারী কিংবা বে সরকারী কোন সহযোগীতার ছোঁয়া পাইনি। তবু আশা একটু সহযোগিতা; যদি একটু দাঁড়াতে পারি।

বাঘের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে জয়ী ফাতেমা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকুলীয় এলাকা সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা ।আর এই উপজেলার অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সুন্দরবন কে কেন্দ্র করে । সুন্দর বনের সাথে তাদের জীবন ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত । যতই দিন যাচেছ ততই দরিদ্র মানুষের আশঙ্কা বাড়ছে ।এমনি এক পরিবার থেকে সুন্দর বনে মাছ ধরতে যেয়ে সুন্দর বনে বাঘের সাথে মুখোমুখি সংঘষে জয়ী ফাতেমা ।শ্যামনগর উপজেলার রমজাননগর ইউনিয়নের কালিঞ্চে গ্রামে এক চিলতে খাস জমিতে সুখের স্বপ্ন নিয়ে বসবাস করত ফাতেমা । সংসারে সুখের স্বপ্ন দেখতে থাকে, তাই সন্তান রহিমের বই কেনা ও ঘরের ছাওনি দেয়ার প্রত্যাশায় ফাতেমা বনে গিয়েছিল । ফাতেমার স্বপ্ন বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে গেল, ২০০৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ১০ টায় সুন্দরবনের কৃষ্ন খালী নামক স্থানে চিংড়ী পোনা সংগ্রহ করতে যেয়ে । এ সুযোগে ওৎ পেতে বসে থাকা বাঘ ফাতেমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । ফাতেমা ততক্ষনে চিংড়ীর রেনু পোনা সংগ্রহ করা নেট জাল বাঘের মুখে ধরে সংগ্রাম করেছে প্রায় ১০ মিনিট । এদিকে সাথীরা চিৎকার শুনে দা কুড়াল নিয়ে ফাতেমাকে উদ্ধার করে জীবিত অবস্থায় । ফাতেমাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে । শুরু হয় জীবনের কঠিন অধ্যায় । ফাতেমার স্বামী কওছার আলী পঙ্গু কোন প্রকার ক্রাচের উপর ভর করে চলতে পারে । পরিবারে এক মাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি ফাতেমা সংসার নির্বাহ করত, ফতেমা আক্রান্ত হওয়ায় শিশু পুত্র রহিম ও শিশু কন্য তাছলিমা সহ পঙ্গু স্বামী কওছার মোড়ল কান্নায় বুক ভাষায় । কে দেবে আহার, কে যোগাবে চিকিৎসার জন্য খরচ ওষধ । নিরুপায় হয়ে ফতেমার পরিবারের শেষ সম্বল জাল নৌকা বিক্রি করে দেয় চিকিৎসার জন্য । সরকারী কিংম্বা বেসরকারী সংস্থা ও স্থানীয় মানুষের কাছে সহযোগিতা চাইলে কোনও সাহায্য পায়নি ফাতেমার পরিবার, করুনার ভিক্ষা মেলেনি মিলেছে লাঞ্চনা ও তিরস্কার । অনেক কষ্টে মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করে জীবন ফিরে পেয়েছে ফাতেমা । আবার ও লাগামহীন পরিশ্রমের মধ্য সংসারের হাল ধরে ছুটে চলেছে ফাতেমা ।

পঙ্গু পৃথিবীতে খোড়া মুন্নী

সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্ম হয়নি মুন্নীর । তাই বইয়ের ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে স্কুল ভ্যানে ছুটে চলা ওদের কাছে স্বপ্ন ।তবু একধরনের স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল তার । ১২বছরের মুন্নী ৫ম শ্রেনীর ছাএী ।পিতার অসমর্থে মুন্নীর পড়াশুনায় ছেদ পড়ল । রেনু পোনা সংগ্রহের জন্য থালা,গামলা ঝিনুকও নেট জাল নিয়ে চলে নদীতে । সারা দিন রেনু পোনা সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রয় করে ঘরে ফেরে ।এ ভাবে যেন একটু একটু করে জীবন স্রোতের প্রতিকুলে বইতে থাকে । জীবন যাদের ঘোলা জলে ডোবা বড় কোন সৌভাগ্য সেখানে ধরে না ।সময়টা ১৯৯৬ সালের ১৬ মে বিনা মেঘে বর্জ্রা ঘাতের মত চরম দুভাগ্য নেমে আসে তার জীবনে । জাল টানতে টানতে হঠাৎ হাঙ্গরে কেটে নিয়ে যায় ডান পায়ের গোড়ালী খেকে, শুরু হয় পঙ্গ জীবন । এক দিন বাপের সংসারে সে ছিল অবলম্বন আজ সে বোঝা । আর অর্থাভাবে যার পেট চলে না,তার জন্য চিকিৎসার সুযোগ অবান্তর । পঙ্গু জীবনের সম্বল হয় ক্রাচ । জীবনের এহেন ক্রান্তি কালে সুপ্নের মত অষ্ঠাদশী মুন্নীর জীবন দরিয়ায় নোঙ্গর ফেলে একটি ছেলে ।শ্যামনগরের খান পুর গ্রামের শহীদ গাজী । শহীদ মুন্নীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় । প্রস্তাবে সাড়া দেয় মুন্নী, কিন্তু সে তো ক্ষনিকের অতিথি, সংসারে কন্য সন্তানের আগমন ঘটে । কিন্ত এই সুখই যেন মুন্নীর জীবনে আধার নিয়ে আসে ,সন্তানকে বোঝা মনে করে চম্পট দেয় বসন্তের কোকিল শহীদ । শুরু হয় মুন্নীর নতুন জীবন । হাতে ক্রাচ মনে অসহায়ত্বের মেঘ । ভাইয়ের সংসারে সে এখন অসহ্য বোঝা । বৃদ্ধা বাবা মা যেখানে ঠাঁই হীন সেখানে মুন্নীর বোঝাতো বিষাক্ত হবেই ।পঙ্গু হয়ে ভাইদের সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচেছ । বিনিময়ে পায় লাঞ্চনা আর তিরস্কার । নিরবে সব সয়ে যায় মুন্নী শুধু একমাত্র সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে । ।বর্তমানে অনেক সরকারী কিংম্বা বেসরকারী সংস্থা মুন্নীর জীবন বৃত্তান্ত উদঘাটন করে কিন্ত মুন্নীর জীবন যে তিমিরে সেই তিমিরেই হাহাকার করছে ।শ্যামনগর উপজেলার সুন্দরবনের কোল ঘেষে মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের পূর্ব কালিনগর গ্রামে বাপের বাড়ীতে থেকে মুন্নীর জীবনে এই অভাবনীয় সংকটের মুখে মুক্তির প্রহর গুনছে ।